১২ অগাস্ট ২০২২

রাহনুমা সুলতানা

আমার নাম রাহনুমা সুলতানা, আমি আর আমার স্বামী শাহীদ আকতার নরউইচের ডাসিনডেল এলাকায় থাকি। আমার বাবার চট্টগ্রামে সরকারী চাকরির সূত্রে- আমার জন্ম চট্টগ্রামে, যদিও আমি মূলত সিলেটের মেয়ে। আমার দাদাবাড়ি ভারতের আসামের করিমগঞ্জে, নানাবাড়ি বাংলাদেশের জকিগঞ্জে। আমার বাবা মৌলভীবাজারের শমসেরনগরে বাড়ি করেছিলেন, কিন্তু সে বাড়িতে আমাদের কখনো নিয়মিত থাকা হয়নি, বার্ষিক পরীক্ষার পরের ছুটিতে যেতাম। আমার স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি সব চট্টগ্রামে। আমার বাবা রেলওয়েতে চাকরি করতেন, সেই সুবাদে আমরা রেলওয়ে কলোনিতে থাকতাম। কলোনির একেক বিল্ডিং-এ ৬-টা করে ফ্ল্যাট, জনবহুল এলাকা। ফলে সেখানে প্রচুর বাচ্চাকাচ্চা ছিল, বন্ধুবান্ধব ছিল। স্কুলের সময়টুকু ছাড়া বাকি পুরোটা সময় আমরা বাইরে খেলতাম, গাছে চড়তাম, মাগরিবের আজানের পর বাড়িতে ঢুকে পড়তে বসতাম। নাচ-গান-আবৃত্তি-অভিনয়, খেলাধুলা সবই করতাম। মা ছিলেন পুরোপুরি গৃহিনী, আট ভাইবোনের বিশাল সংসারের সবকিছু নিজহাতে করতেন। বাবা যেমন রসিক ছিলেন, মা-ও তেমনি বন্ধুর মতো।

আমাদের বিয়ের সূত্রপাত ১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে আমার মামা-শ্বশুরের চেম্বারে যাওয়া থেকে, তিনি স্পেশালিস্ট ডাক্তার ছিলেন। আমি যখন চেম্বার থেকে বের হয়ে আসি, তখন লুকিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী ও মাকে ফোন দিয়ে আমাকে চেম্বার থেকে বের হয়ে যেতে দেখতে বলেন। শাহীদের জন্য তখন ওঁরা পাত্রীর সন্ধান করছিলেন। এর কয়েকদিন পরে বিজয় মেলা, যেখানে বইমেলা হচ্ছিল সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। গিয়ে দেখি শাহীদরা এসেছেন। আমি তখন মাত্র অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, তখন তো বিয়ের সময় নয়! আমার খুব রাগ হলো। আমি শাহীদের দিকে মুখ তুলে তাকাইনি। এর ৩-৪ দিন পর তাঁরা আমাদের বাড়িতে আসেন, সেদিন আমি শাহীদের দিকে তাকিয়েছি, কথা বলেছি, ভালোও লেগেছে। এর ১৫-২০ দিনের ভেতর আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরে ঢাকায় এসেছিলাম, তারপর স্বামীর সঙ্গে ১৯৯৭-এ এসেছিলাম ইউকে, ওর পরীক্ষা ছিল সাউথশিল্ডে। খুব ভালো লেগেছিল এখানে। পরে লেকচারার হিসেবে যখন সে এলো, আমরা স্কটল্যান্ডের শেটল্যান্ডে সংসার পাতলাম। ২০১৩ সাল থেকে নরউইচে আছি, আজ ৯ বছর। নরউইচ খুব সুন্দর, নিজের দেশের পরে নরউইচই আমাদের সবচেয়ে আপন, আর কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই।

আমাদের তিন ছেলেমেয়ে। যখন অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ি, তখন আমার বড় মেয়ের জন্ম। ও যখন পেটে এলো, তখন আমরা জাহাজে ছিলাম। সেই জাহাজ ইন্দোনেশিয়া গেল, ইন্দোনেশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে আমি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ১২-১৩ দিনের দীর্ঘ যাত্রা, ডাক্তার দেখাবার কোন অবকাশ নেই, আমি জানি না আমি অন্তঃসত্তা। আমার অসুস্থতার কারণে শিপ থেকে নেমে এক বন্ধুর বাড়িতে এক সপ্তাহ রইলাম, তারপর আমাকে

দেশে পাঠিয়ে দেয়া হলো। গর্ভকালীন ৯ মাস আমি বিছানায় ছিলাম, সঙ্গে স্বামী নেই, বাড়িতে স্যালাইন দিয়ে রাখতে হচ্ছে আমাকে, মাঝে মাঝে হাসপাতালেও যেতে হচ্ছে। এভাবেই প্রথম সন্তানের জন্ম। ওকে পালতে বেশ কষ্ট হয়েছে আমার। একে বয়স কম, তায় নিজের পড়ালেখার চাপ, শ্বশুরবাড়ি ঢাকায় আর বাবার বাড়ি চট্টগ্রামে যেখানে আমি লেখাপড়া করছি—ফলে প্রতিমাসে যাতায়াত করতে হতো। আমার এই বাচ্চার জন্মের দেড় মাসের মাথায় আমার বাবা মারা যান, তখন মনে হতো বাবার অভাব যেন আমার এই সন্তানই পূরণ করছে। মাতৃত্ব খুব উপভোগ করেছি তখন, মেয়েই ছিল আমার পুরো পৃথিবী। ভারী দুষ্টু ছিল সে, আমার ভাইয়ের আফটার শেভের পুরো বোতল মাথায় ঢেলে দিয়ে বলতো—মামার তেল মেখেছি। তার দেড়-দুই বছর বয়স থেকে আবার সেইল করা শুরু করলাম। প্রতি বছর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে আমি জাহাজে চলে যেতাম তিন মাসের জন্য। দেড় বছরের মেয়েকে নিয়ে একা একাই প্লেনে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে গিয়ে জাহাজে উঠতাম। অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে মেয়ে একবার হারিয়ে গেল, দোকানে গিয়ে কাপড়ের আড়ালে চুপ করে বসে থাকতো সে। শেষবার সে হারালো ২০০৫এ, পূজার সময় জাহাজ এসেছিল কলকাতায়, তখন আমি চাকরি করছি, সেইল করব না বলে ১৫ দিনের ছুটি নিয়ে আউটার অ্যাঙ্করে থাকা জাহাজে গিয়ে থাকি। ক্যাপ্টেন হিসেবে শাহীদ তখন অনেক ব্যস্ত, প্রতিদিন বের হতে পারে না। আমি তো জাহাজ থেকে নেমে বন্দরে যেতে চাই, কেনাকাটা করতে চাই। সেদিন গেছি নিউমার্কেটে, সঙ্গে আমার পাঁচ বছরের মেয়ে। মেয়ে হারিয়ে গেল, ৪৫ মিনিট ধরে আর তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। একজন দেখলো ছোট্ট মেয়ে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে, নাম জিজ্ঞেস করলে বল্লো—ইশরা। ওরা তো ইশরা নাম বোঝেনি, মাইকে ঘোষণা করছে—কৃষ্ণা নামের একটা মেয়ে পাওয়া গেছে, অভিভাবক থাকলে যেন যোগাযোগ করেন। আমার মেয়ের নাম তো কৃষ্ণা নয়, তবু গিয়ে দেখি আমার মেয়েকেই পেয়েছে ওরা।

পেশাগতভাবে আমি এদেশে প্রাইমারি স্কুলে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছি। আমি একজন কোয়ালিফায়েড টিচার। বাংলাদেশে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেছি, তারপর একটি স্কুলে গণিতের শিক্ষক হিসেবে ৫ বছর কাজ করেছি। এদেশে এসে প্রথম ভেবেছিলাম কলেজে যোগ দেব। শাহীদ যে কলেজে লেকচারার ছিল, সেখান থেকে অ্যাডাল্ট লার্নিং-এর উপর কোয়ালিফিকেশন নিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল ইকনমিক্সে কিছু করার। কিন্তু আমাদের তখন ছোট ছোট দুই বাচ্চা, একটি মাত্র হয়েছে, কোর্স চলাকালীন আরেকটি বাচ্চা হলো, এদের দেখভাল করে তারপর চাকরি করতে হবে ভেবে ফুলটাইম চাকরির চিন্তা ছাড়তে হলো। ফুলটাইম শিক্ষকতায় যাচ্ছি না কারণ শিক্ষকদের এখানে দীর্ঘ সময় ধরে স্কুলে থাকতে হয়, একেবারে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা।তখন বাচ্চাকে চাইল্ডমাইন্ডারের কাছে রেখে কাজ করতে হবে। চাইল্ড কেয়ারে বাচ্চাদের রেখে কাজে যেতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না। বাচ্চাদের আমি স্কুলে আনা-নেয়া করি। স্কুলে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সব বিষয় আমাকে পড়াতে হয়, তবে গণিতের ওপরই আমি ফোকাস করি।

আমাদের বাচ্চাদের বাংলা শেখানোর জন্য নরউইচে বাংলা স্কুল-ধরণের কিছু যদি আমরা করতে পারি সেটা খুব ভালো হয়। আমার বড় মেয়ে জিসিএসইতে বাংলা রেখেছিল, কিন্তু স্কুলে তো বাংলা পড়ায়নি, আমি নিজে পড়িয়েছি। বাংলা পড়া-লেখার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারলে আমাদের প্রজন্মগুলোর ভেতর সম্পর্ক আরো গাঢ় হবে। এখানে অনেকেরই শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে, একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিলে আমরা সেটাকে চালিয়ে নিতে পারব।